# একক □ ৬ : (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : সংক্ষিপ্ত পরিচয়)।

গঠন :

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ মূলপাঠ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

৬.২.১ প্রাচীন যুগ

৬.২.২ মধ্য যুগ

৬.২.৩ আধুনিক যুগ

৬.৩ নির্বাচিত পাঠ

৬.৪ উত্তর সংকেত

## ৬.০ উদ্দেশ্য

**এককটি পাঠ করার পর আপনি**

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের রচনাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

## ৬.১ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের তিনটি যুগ প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগ। বর্তমান এককে তিনটি যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। অল্পপরিসরে হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করা অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মূল গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হল।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

| প্রাচীন যুগ | মধ্য যুগ | আধুনিক যুগ |
|---|---|---|
| (৯০০-১২০০ খৃষ্টাব্দ) | (১৩৫০-১৮০০ খৃষ্টাব্দ) | (১৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক কাল) |

প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের কবিকুল, এবং তাঁদের রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের আদিযুগ। এই পর্বে সমাজ-কাঠামো, জনজীবন, কীভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, রচয়িতাদের পরিচয় এবং অন্যান্য তথ্য দেওয়া হয়েছে।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙলার সমাজে বিপর্যয় নেমে আসে। এই সময় কোনও সাহিত্য রচনার নিদর্শন মেলে না। সাহিত্যের ইতিহাসে এই অধ্যায়কে শূন্যতার যুগ বলা হয়।

খ্রীঃ ১৩৫০ থেকে ১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগ। এক হাজার বছর ব্যাপ্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য, আকার এবং বৈচিত্র্যে বিশাল। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, প্রাক্-চৈতন্য এবং চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য, চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের, পাশাপাশি আছে ইসলামী সাহিত্য। মধ্যযুগের এই সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন ভাগে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্য যেমন হয়েছে ; চৈতন্য পূর্ববর্তী, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য পরবর্তী, চার শতাব্দী ধরে লেখা মঙ্গলকাব্যগুলিকে একটি অংশে সাজানো

হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য এবং অন্য শাখাগুলি, একত্রে গ্রথিত করে আলোচনা করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য এবং মুসলমানী রোমান্টিক প্রণয়কাব্য আলোচনায় শুধু কাহিনীর উল্লেখ আছে। সবিস্তার আলোচনা করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, বিখ্যাত কবিদের নামই বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ যুগসন্ধিক্ষণের কবি। মধ্যযুগের সমাপ্তি আর আধুনিক যুগের সূচনাকাল হলো ইতিহাসে যুগসন্ধির পর্ব। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের কাব্যে যুগসন্ধির লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছে। সংক্ষেপে সেই সময়টির কথা বলা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে বাংলার 'নবজাগরণের যুগ' বলা হয়। নবজাগরণ পর্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে এই এককে। আধুনিক যুগের রচয়িতা, মনীষীদের নাম এবং তাঁদের প্রতিভার কথা উল্লেখ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষপর্ব ধরার চেষ্টা হয়েছে।

## ৬.২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

সাহিত্যে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের রূপান্তর ঘটেছে। বাঙালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সঙ্গে সমতা রেখে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্য তিনটি যুগে বিভাজিত। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ।

### ৬.২.১ প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপদ'। খ্রীস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদ রচিত হয়। নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। গীতিকবিতার নাতিদীর্ঘ কাঠামোয় চর্যাপদ লেখা হয়। ৪৬টি পদ বা কবিতা সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। গ্রন্থের নামকরণ করেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। ২৪ জন পদকর্তার নাম পরিচয় মিলেছে। উল্লেখযোগ্য পদকর্তারা হলেন লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুম্পাদ, সরহপাদ প্রভৃতি।

সহজিয়া মতবাদ ও সাধনপদ্ধতি হল চর্যাপদের মর্মবস্তু। চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র, নির্বাণ বা মুক্তিলাভ এবং বৌদ্ধদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। তত্ত্ব আড়াল করে লৌকিকজীবনের কথাও বলা হয়েছে। ফলে ভাষায় এসেছে সাংকেতিকতা চর্যার ভাষাকে তাই 'সন্ধ্যা ভাষা' অর্থাৎ আলো-আঁধারি ভাষা বলা হয়। চর্যাপদে নিম্নবর্ণের মানুষের আচার-আচরণ, জীবিকা-নির্বাহ, জীবনযাপনের পরিচয় পাওয়া যায়। ডোমনারী, অরণ্যচারী শবর-শবরী, নৌ-নির্মাতা, গৃহনির্মাতা এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের উল্লেখ আছে। কৃষিকাজ, শিকার এবং অন্যান্য পেশার ছবি পাওয়া যায়।

কাব্যরস অপেক্ষা তত্ত্ব, অর্থাৎ সাধনকথা, চর্যাপদে মুখ্য হলেও হাজার বছর আগের বাঙলার সমাজজীবনের পরিচয় মেলে।

### ৬.২.২ মধ্যযুগ :

ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত (খ্রীস্টাব্দ ১২০০-১৩৫০) বাংলা সাহিত্যের কোনও নিদর্শন মেলে না। তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালীজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। অস্থির সময়ে সাহিত্য শিল্প সৃষ্টি হয় না। বাংলা সাহিত্যে প্রায় দেড়শো বছর বন্ধ্যাত্ব

পর্ব চলেছিল। এই পর্যায়ে লিখিত সাহিত্যের নমুনা মেলেনি। প্রাচীনযুগের সমাপ্তি, এবং মধ্যযুগের সূচনা-কাল তাই অন্ধকারময়, শূন্যতার যুগ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে অনুবাদ সাহিত্য। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বাংলা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', অনুবাদ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ফুলিয়া গ্রামে বসবাস করতেন। গৌড়েশ্বরের প্রদত্ত প্রশংসা তাঁকে রামায়ণ অনুবাদে অনুপ্রেরণা যোগায়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচনা থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস অনূদিত রামায়ণ ১৮০২— ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনারী, উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে মুদ্রিত হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বাঙালীর গৃহধর্ম ও গার্হস্থ্যজীবনের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। বাল্মীকির রামায়ণের সীতা তাঁর হাতে বাঙালী কুলবধু হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে অনেক কবি রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের মতো জনপ্রিয়তা কেউ অর্জন করেননি।

বাল্মীকি রামায়ণের মতো ব্যাসদেবের মহাভারতও অনূদিত হয়েছে। বাংলায় মহাভারতের প্রধান অনুবাদকের নাম কাশীরামদাস। অনুমান করা হয় সপ্তদশ শতকের (১৬০২-১৬১০ খ্রীস্টাব্দ) প্রথম দশকে তিনি মহাভারত অনুবাদ করেন। বর্ধমান নিবাসী কাশীরামদাস বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত মহাভারতের মতো বিশাল কাহিনী, উচ্চতর জীবনের আদর্শ, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, এ সবই কাশীরামের অনুবাদে সহজ প্রচেষ্টায় উঠে এসেছে। মহাভারত অনুবাদ রামায়ণের মতো বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তী সময়ে কাশীরামের অনুবাদ অনুসরণ করে কয়েকজন কবির মহাভারত অনুবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

মালাধর বসু মধ্যযুগে ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের সরল সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। তাঁর নিবাস ছিল বর্ধমানের কুলীন গ্রামে। গৌড়েশ্বর কবিকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দিয়েছিলেন। ১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দের মধ্যে তিনি কাব্য রচনা করেন। এখানে প্রথম কৃষ্ণকে 'প্রাণনাথ' বলা হয়েছে। তাঁর অনুবাদটি যেন বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিরই প্রতিচ্ছবি। পরবর্তী বাঙলার বৈষ্ণবসমাজে শ্রীকৃষ্ণবিজয় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে কাব্যটির সার্থকতা আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের উৎসমুখ খুলে গেলেও জোয়ার আসে আরও কিছুদিন পরে। সে জোয়ারে বাঙালী জীবনে এল নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা। প্রেরণাদাতা ছিলেন, সমগ্র বাঙালী জাতির প্রতিভূ শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব যে নতুন প্রেমধর্মের আদর্শ প্রচার করলেন, তার প্রভাবে সমসাময়িক মৃতপ্রায় বাঙালী নিজের মহিমায় জেগে উঠল।

চৈতন্যদেব ইংরেজী ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দ, ১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। চৈতন্যদেবের মৃত্যুসন ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ। সাধারণ হিসাবে আটচল্লিশ বছর তাঁর জীবন। স্বল্পায়ু জীবনের অর্ধেক নবদ্বীপে, অর্ধেক জীবন কাটে নীলাচলে। শেষ আঠারো বছর তিনি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়েছেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তারপর তাঁর দেহে, মনে এক প্রেম প্রবাহ সঞ্চারিত হয় এবং মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে তিনি সচেষ্ট হলেন। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নেবার পরে তাঁর ভক্তিভাবাবেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

সৃষ্টির পর্যায়ে প্রাণের সর্বোত্তম প্রকাশ হল মানুষ। মানুষই আবার দেবতাকে গড়ে তুলছে। সুতরাং 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা. নরবপু- তাঁহার স্বরূপ।'

এভাবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অতীত থেকে টেনে এনে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করে বাঙালীর চিন্তাধারাকে আধুনিক খাতে তিনি বইয়ে দিলেন। তবে চৈতন্য প্রবর্তিত দৃষ্টিকোণই বৈষ্ণবসাহিত্যের বিচার্য নয়। তিনি সমগ্র বাঙালী সমাজ ও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছেন।

চৈতন্যদেবের পূর্বে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচয়িতা কিছু কবির পরিচয় আমরা পাই। এর মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, দ্বিজ চণ্ডীদাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগের সূচনাতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচিত হয়। রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাস। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে 'বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎ বল্লভ' বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাচীন পুঁথিটি আবিষ্কার করে সম্পাদনা করেন। পুঁথির নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। সহজ, সরল ভাষায় নাটকীয় ভাবে কৃষ্ণ- রাধা- বড়ায়ি প্রভৃতি চরিত্রগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাক চৈতন্য পর্বে রচিত তাঁর কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ সমাদর পেয়েছে।

বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস, এই দু'জন কবির কাব্যের বিষয় ছিল, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। সুতরাং চৈতন্যপূর্বযুগে বৈষ্ণব পদাবলীর একটি বিশেষ স্তর পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, কেউই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত নন, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁদের বিশিষ্ট স্থান আছে। তার প্রধান কারণ তাঁদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন। উভয় কবির রচনার বিষয় এক হলেও ভাব ও প্রকাশে পার্থক্য রয়েছে। চণ্ডীদাস সহজ, সরল প্রাণের কবি। তাঁর অঙ্কিত রাধা গভীর মনের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছে। বিদ্যাপতির রাধা তুলনামূলক ভাবে চঞ্চলপ্রাণা দু'জনের ভাষাশৈলীও আলাদা। ভাষার ক্ষেত্রে দুই কবির স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। ভাষার জন্যই রাধা চরিত্রটি দুজন কবির কাছে দু'রকমভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মহাভাবে আশ্রিত চৈতন্যদেবকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে যাঁরা পদ রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষ, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস প্রমুখ কবিগণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর যাঁরা পদ রচনা করেছেন; তাঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস, যাদবেন্দ্র, ঘনরাম দাস উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস শুধু কবি, ভক্ত নয়। তাই তাঁদের লেখায় তত্ত্ব নেই। তত্ত্ব বলতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যা বুঝিয়েছেন তা হল, প্রিয়তমকে কান্তভাবে বা ভগবানরূপে উপাসনা করা হলো ধর্মের শেষ কথা। রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্ক তাঁদের কাছে তত্ত্ব হয়ে উঠল। লৌকিক জীবন বা নায়ক-নায়িকার প্রেম সম্পর্ক, মা-সন্তানের বাৎসল্য সম্পর্ক রাধা-কৃষ্ণ প্রতীকে কবিরা পদ রচনা করেছেন। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'- গ্রন্থদুটিতে বৈষ্ণব তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই ব্যাখ্যা অনুসারে পদকর্তারা পদ রচনা করতেন। রসতত্ত্ব নির্দেশিকায় পূর্বরাগ, অভিসার, মান, মাথুর ইত্যাদির সংজ্ঞা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পদাবলী সাহিত্য ছাড়া এই সময়ে সাহিত্যের আরেকটি দিক লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ ও নীলাচলের লীলা নিয়ে চরিতসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। আদি দুই জীবনীকার, মুরারি গুপ্ত এবং স্বরূপ দামোদর দুজনেই চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে জীবনীকাব্য লিখেছেন। মুরারিগুপ্তের 'শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য— চরতিমৃতম্', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন দাশের চৈতন্যভাগবত এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত', উৎকৃষ্ট জীবনীকাব্য। পরবর্তীকালে এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু কবি বাংলায় চরিত-সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেছেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা করার সময়ে পদকর্তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে 'রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত'— শ্রীগৌরাঙ্গ অর্থাৎ চৈতন্যদেবের প্রেমময় মুখ। বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একধারে রাধা ও কৃষ্ণ। চৈতন্যদেবের দিব্যজীবনকে যাঁরা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কবি। রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ আরাধনা লক্ষ করে পদকর্তারা

যে সব গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ লিখেছেন, সেগুলিকে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়ে থাকে। গৌরচন্দ্রিকা অর্থ হলো ভূমিকা। পালা শুরু করার আগে কীর্তনীয়ারা গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে বুঝিয়ে দেন যে এরপর রাধা-কৃষ্ণের কোন বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। এ ছাড়া বাল্যলীলার গৌরাঙ্গপদও আছে। সেগুলি অবশ্য রাধাভাবে ভাবিত নয়। তাই গৌরচন্দ্রিকা বলা যায় না। জীবনীসাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্য নিয়েই সুসমৃদ্ধ ছিল ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি মঙ্গলগান সুসংবদ্ধ কাহিনীর আকারে রচিত হয়ে প্রচার লাভ করেছিল। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক এই আখ্যানি কাব্যগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

'মঙ্গল' কথাটির অর্থ কল্যাণ, অর্থাৎ গৃহকল্যাণ বিষয়ক রচনাকে মঙ্গলকাব্য বলে। মঙ্গলকাব্য, দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনী। তাঁরাই প্রধান চরিত্র। মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি ধারা হল, মনসাদেবীকে নিয়ে মনসামঙ্গল, চণ্ডীদেবীকে নিয়ে 'চণ্ডীমঙ্গল', ধর্মঠাকুরকে নিয়ে 'ধর্মমঙ্গল'। মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মনসামঙ্গলকাব্য, ষোড়শ শতাব্দী থেকে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধর্মমঙ্গলকাব্য লেখা শুরু হয়। শিবায়ন, বা শিবমঙ্গল নামে মঙ্গলকাব্যের চতুর্থ একটি ধারা আছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল আটদিন ধরে, এবং ধর্মমঙ্গল বারোদিন গাওয়া হয়ে থাকে।

মনসা পৌরাণিক দেবী। 'মনসা' নামটি বেদেও পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত মনসামঙ্গলের মূল বিষয়, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। মনসার গীত প্রথম রচনা করেন বলে কাণা হরিদত্ত। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, মনসাঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি। চৈতন্য সমসাময়িক মনসামঙ্গলে কাব্যের কবি নারায়ণদেব এবং সপ্তদশ শতকে মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ।

চন্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী মহিষাসুর বিনাশিনী নন, তিনি অভয়া বনদেবী। কাব্যে দুটি কাহিনী আছে। এক, 'আখেটিক খণ্ড', দুই 'বণিকখণ্ড।'

প্রথম খন্ডে দেবী অরণ্যের পশুমাতা। ব্যাধের অত্যাচার থেকে পশুদের রক্ষার জন্য ব্যাধকে প্রচুর সম্পত্তি দিয়ে বনভূমি পরিষ্কার করিয়ে রাজ্যস্থাপন করিয়েছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি অরণ্যপালিকা। দূর্গত নারীকে অনুকম্পা দেখিয়ে, তাকে দিয়ে পূজা করিয়ে নিজের মহিমা প্রচার করেছেন।

চণ্ডীমঙ্গলের আঁদি কবির নাম, মাণিক দত্ত। তবে এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। দেবদেবী মাহাত্মা প্রচারের আড়ালে কবিরা মানুষের জয়গান করেছেন। মঙ্গলকাব্য যেহেতু মধ্যযুগের সাহিত্য, স্বাভাবিকভাবে সেখানে দেবতা প্রাধান্য পেয়েছে। তবুও কাব্যগুণে মঙ্গলকাব্যে যথেষ্ট মৎকারিত্ব রয়েছে।

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য অবলম্বন করে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষত্ব হল যে, কেবলমাত্র বাঙলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে এর প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। এর কারণ বোধকরি, তবু মনসা বা চণ্ডীর মতো ধর্মদেবতার মাহাত্ম্য এত ব্যাপক নয়। একমাত্র ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ধর্মপূজায় পৌরহিত্য করার অধিকার পেয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের দেবতা প্রধানত নারী। ধর্মমঙ্গলে পুরুষ্ দেবতা স্থান পেয়েছে। বীররসের প্রকাশ প্রথম পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যে। কাব্যকাহিনীতে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বিবরণে ঐতিহাসিক পটভূমির আভাস পাওয়া যায়। গৌড়ের সম্রাট ধর্মপালের পুত্রের সঙ্গে অজয় নদের দক্ষিণ তীরবর্তী একটি পার্বত্য গড়ের অধিপতি ইছাই ঘোষের যুদ্ধের বৃত্তান্ত নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত।

কাব্যের আদিকবি হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন ময়ূরভট্ট। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কবির নাম খেলারাম চক্রবর্তী। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া আরও কয়েকজন মধ্যে রামদাস আদক এবং

সীতা রাম দাস উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগীয় চেতনায় ধর্মের একটি বিশেষ স্থান ছিল। ফলে, স্বাভাবিকভাবে সাহিত্য ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। বৈষ্ণবপদাবলী রোমান্টিক কাব্য হলেও ধর্মীয় তত্ত্ব বা দর্শনিকতা বহির্ভূত নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ রচনায় দেবতা সম্পর্কে ভীতি যতটা আছে, ততটা ভক্তি নেই।

ধর্ম ও দেবতা বাদ দিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকখানি প্রেমগাথা রচিত হয়েছিল। রচয়িতারা মুসলমান কবি। তাঁদের কাব্যের শ্রোতা, পাঠক আরাকানের রাজা এবং রাজপুরুষ সম্প্রদায়। গোহারি দেশের রাজা লোরের সঙ্গে ময়নাবতীর বিবাহ হয়; কিন্তু চন্দ্রাণী নামে অপর নারীর সঙ্গে রাজা লোর প্রণয়ে আবদ্ধ হয়, বহুক্লেশের পর উভয়ের মিলন হয়। প্রথমখণ্ড তাই লোরচন্দ্রাণী নামে অভিহিত।

দ্বিতীয়খণ্ডে আছে, সতীময়নার বিরহের বর্ণনা কাহিনীর শেষে ময়নার কৌশলে চন্দ্রাণীকে নিয়ে তার কাছে লোর ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাহিনী দুটি দেবতাবিহীন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার আনুকূল্যে বাংলাসাহিত্যের দু'জন বড় কবি হিন্দিতে লেখা প্রণয়কাব্য ভাষান্তর করেন। সতীময়না বা লোরচন্দ্রাণী কাব্যের রচয়িতা হলেন দৌলতকাজী। তিনি শক্তিশালী কবি ছিলেন। গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বেই দৌলতকাজীর মৃত্যু হয়। দৌলতকাজীর কাব্যরচনার আনুমানিক সময়কাল ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দ।

আরাকান বা রোসাঙ্গের রাজসভায় দৌলতকাজীর পরে আসেন সৈয়দ আলাওল। তিনি ছিলেন সভার শ্রেষ্ঠ কবি। দৌলত কাজীর অসমাপ্ত গ্রন্থ তিনি শেষ করেন। আলাওলের প্রধান কীর্তি 'পদ্মাবতী' কাব্য। তিনি আরও কয়েকটি কাব্য ও কিছু গান রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন।

প্রাচীনযুগের বাঙলাসাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাথযোগী ও সিদ্ধাচার্যদের নাম। নাথযোগীদের কাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত। একটি সিদ্ধাদের কাহিনী, অপরটি মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোরখনাথের কাহিনী। প্রথম কাহিনীর মূল বিষয় হল, শিষ্য গোরখনাথ কামিনী মোহগ্রস্ত গুরু মীননাথকে উদ্ধার করেছেন কাহিনীর নাম তাই মীনচেতন বা গোরখবিজয়। দ্বিতীয় কাহিনীর বিষয় হল, রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ। কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ হল রাজপুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণের অধ্যায়। ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন হলেন কাহিনীগুলির প্রধান কবি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ বাংলা সাহিত্যে যুগসন্ধিক্ষণ নামে চিহ্নিত হয়েছে। মোঘল শাসন অবলুপ্তির পথে পা দিয়েছে আর ইংরেজ, আগমন সূচিত হচ্ছে তাই যুগসন্ধি। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। এমনই এক মুহূর্তে দু'জন বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের আবির্ভাব ঘটে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অনুসরণে ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্নদামঙ্গলকাব্য রচনা করেন। রামপ্রসাদও এই সময় রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য। কাহিনীর কাঠামোতে বিশেষ কোনও ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না। এমনকি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে গঠন বিন্যাসে মূল পরিবর্তন আনা হয়নি। রামপ্রসাদ মূলত শাক্তিপদাবলী রচনার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। আগমনী ও বিজয়া পর্বের পদ এবং ভক্তের আকুতি শীর্ষক পদগুলি বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ভাগীরথীর পূর্বতীরে নবাবী শাসনের ব্যর্থতা,

পশ্চিমতীরে বর্গিদের অবাধ লুণ্ঠন, বিদেশী জলদস্যুদের বাঙলার উপকূল অঞ্চলের ফসল অপহরণ বাঙলার সমাজ ও গার্হস্থ্যজীবন দুর্বিসহ করে তোলে। ঘরে ঘরে অন্নাভাব, রুচির অধঃপতন দুঃখ দুঃসহ দুর্দিনের কালোছায়া ফেলেছে। একদিকে দরিদ্র স্বামীর ঘরে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, অন্যদিকে কন্যার পিতৃগৃহে আসার আকুতি এবং জননীর উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা বাড়তে থাকে। সংকটগ্রস্ত মানুষের আকুল প্রার্থনা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' এই দুঃসময়ের প্রতিচ্ছবি।

যুগসন্ধির নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের মতো কবিদের বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। যুগচেতনা, সমাজবোধ, ভক্তি ও সুগভীর আকুতি, দেব-দেবীর বাস্তবায়ন, সর্বোপরি ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কারের বৈচিত্র্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা কাব্য সমকালীন যুগচেতনা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ইংরেজি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগে প্রচলিত বাঙলা সাহিত্য ধারার পাশাপাশি আরেকটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এই ধারার সাহিত্য লিখিত সাহিত্য নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো তত্ত্বাশ্রিত গীতিকবিতা। নতুন যুগের এই সাহিত্যকে বলা হয়, কবিপান। সংস্কৃত 'কবি' শব্দটি এক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয়। এখানে কবিতা রচনাকারীদের 'কবিওয়ালা' বলা হয়েছে। জীবিকার তাগিদে তাঁরা কবিতা রচনা করতেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি রামবসু। রঘুনাথদাস, গোঁজলাগুই, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, হরুঠাকুর প্রমুখ বহু কবিওয়ালার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বল্প শিক্ষিত স্তর থেকে কবিওয়ালাদের উদ্ভব হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছিল পলাশী যুদ্ধোত্তর সমাজে দেখা দিয়েছিল বিশৃঙ্খলা ফলে প্রাচীন আভিজাত্য ভাঙতে থাকে। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও নবাবী দ্বৈতশাসনের সুযোগে কিছু মানুষ নানাভাবে বিত্ত অর্জন করে নতুন নাগরিক সমাজ গড়ে তুলল। গঙ্গাতীরবর্তী কলিকাতা, চন্দননগর, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কবিওয়ালাদের উদ্ভব হয়। একশ্রেণীর নতুন নাগরিক সমাজের মানুষদের মনোরঞ্জন করাই ছিল কবিওয়ালাদের গান রচনার উদ্দেশ্য। বিশিষ্ট শিল্পরূপের বিকাশে তাঁদের লক্ষ্য ছিল না।

---

**অনুশীলনী— ১**

---

**নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য ৫ টি উত্তর থেকে বেছে X চিহ্ন দিন উত্তর করা হয়ে গেলে এককের শেষে দেওয়া ৭৫ পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেত-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন**

১। ক) শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেছেন

(১) চৈতন্যদেব।
(২) বিদ্যাপতি।
(৩) রামপ্রসাদ।
(৪) সরহ।
(৫) মালাধর বসু।

**খ। শাক্তপদাবলীর রচয়িতা—**

(১) রামপ্রসাদ সেন
(২) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
(৩) রূপরাম চক্রবর্তী
(৪) ভারতচন্দ্র

(৫) কাশীরাম দাস।

গ। **চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা—**

(১) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(২) মুরারি গুপ্ত

(৩) কৃত্তিবাস

(৪) আলাওল

(৫) গোবিন্দদাস

**২। নিচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।**

ক) মঙ্গলকাব্যের দেবতা প্রধানত.....

খ) গৌড়েশ্বর মালাধরবসুকে.....উপাধি দিয়েছিলেন।

গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা হলেন.....

ঘ) লোচনদাস.....রচনা করেছিলেন।

## ৬.২.৩ আধুনিক যুগ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সে যুগের সাহিত্য ছিল প্রধানত দেবনির্ভর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে আধুনিক যুগের সূচনা কাল ধরা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে, বিশেষত বাঙলাদেশে ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজি সাহিত্যের যে প্রভাব পড়েছিল, তার ফলস্বরূপ বাংলাসাহিত্য নতুন পথের সন্ধান পেল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও সাহিত্যে পালাবদল ঘটল। ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে উনিশ শতকের বাঙালী সাদরে অনেক কিছু গ্রহণ করে নিল। এ যুগে দেবতা নয়, মানুষই মুখ্য হয়ে উঠেছে সাহিত্যে। কাব্য, নাটক, গদ্য, উপন্যাস, এককথায় নতুন চেতনার উদ্ভব ঘটেছে। উনিশ তাই শতককে বাঙলার নবজাগরনের যুগ বলা হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন যেমন মহাকাব্য রচনা করেছেন, অন্যদিকে ঈশ্বরগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছেন। মহাকাব্যের দেবদেবীরা মানুষ হয়ে সমকালীন কাব্যে দেখা দিলেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামপুরের মিশনারী এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের নতুন দিগন্ত খুলে গেল। যুক্তি নির্ভর গদ্যভাষা হাজির হতে এই যুগের মানুষ তাঁদের বক্তব্য গদ্যে প্রকাশ করতে পেরেছেন। কাহিনীর মাধ্যম হিসেবে গদ্যভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়দত্তের মতন মনীষীদের হাতে বিকশিত হয়েছে গদ্যভাষা। যাঁদের অনুসরণ করে বাঙালী লেখকরা পরবর্তী কালে গদ্যে বৈচিত্র্য দেখাতে পেরেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নাট্যজগতেও নবজাগরণ দেখা দিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশ ঘোষ— বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে পরিচিত। বাঙলা দেশের স্বাদেশিকতা নিয়ে এই নাট্যকারগণ নাটক লিখেছেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ, ট্রাজেডি সব কিছুই তাঁদের নাটকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ হয়েছে।

গল্পের প্রতি মানুষের সবসময়ই আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্যারীচাঁদমিত্র উপন্যাস সুচনার পরে গোড়াপত্তন করলেও প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁকে অনুসরণ আধুনিক বাংলা উপন্যাস পরিণতি লাভ করেছে।

উপন্যাসের পাশাপাশি এসেছে গীতিকবিতা। কবিহৃদয়ের একামন্ত প্রকাশ গীতি-কবিতা। মহাকাব্যের আখ্যান কাহিনী গদ্যের ভাষায় প্রবেশ করতে মহাকাব্যের আবেদন লুপ্ত হয়ে গেল। জন্ম নিল গীতিকবিতা, যার মধ্যে রয়েছে গানের ধর্ম। ঊনবিংশ শতাব্দী মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। কবির একান্ত অনুভূতি গীতিকবিতার প্রাণ।

মধুসূদন দত্তের হাতে গীতিকবিতা রচিত হলেও সার্থক গীতিকবিতা লেখেন

বিহারীলাল চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সাহিত্যিকদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনাসম্ভার বাঙলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

## ৬.৩ নির্বাচিত পাঠ্য

নির্বাচিত পুস্তকতালিকা ও লেখক। ১. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ডাঃ সুকুমার সেন। ইস্টার্ন পাবলিসার্স, কলকাতা- ৭০০০০৯
ডাঃ ক্ষুদিরাম দাস
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা- ৭০০০০৬

### অনুশীলনী— ২

**নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য ৩টি উত্তর থেকে বেছে √ চিহ্ন দিন। উত্তর করার পর এককের শেষে দেওয়া ৭৬ পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেত-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।**

**ক) চর্যাগীতির উদ্ভব-** (১) প্রাচীন যুগ।
(২) মধ্যযুগ।
(৩) আধুনিক যুগ।

**খ) চর্যাগীতির আবিষ্কারক** (১) মালাধর বসু।
(২) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎ বল্লভ।
(৩) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়।
(৪) বড়ু চণ্ডীদাস।
(৫) রামপ্রসাদ।

**(গ) রামায়ণের অনুবাদক** (১) তুলসীদাস।
(২) কাশীরাম দাস।
(৩) কৃত্তিবাস।
(৪) মালাধর বসু।
(৫) দ্বিজচণ্ডীদাস।

**ঘ) মুরারিগুপ্তের জীবনীকাব্য** (১) শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
(২) চৈতন্যচরিতামৃত।
(৩) চৈতন্যমঙ্গল।
(৪) উজ্জ্বলনীলমণি।
(৫) ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

**নিচে কয়েকজন রচয়িতা ও গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। আপনি সেগুলিকে দুই স্তম্ভে উপযুক্তস্থানে লিখুন।**

| | |
|---|---|
| ক) মহাভারত | কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ |
| খ) মনসামঙ্গল | রূপরাম |
| গ) ধর্মমঙ্গল | কাশীরাম দাস |
| ঘ) বৈষ্ণবপদাবলী | জ্ঞানদাস |
| ঙ) সতীময়না | দৌলতকাজী |
| **রচয়িতা** | **গ্রন্থ** |
| ক)..... | ..... |

খ) .....  .....

গ).....  .....

ঘ).....  .....

ঙ).....  .....

**নিম্নলিখিত রচয়িতাদের গ্রন্থগুলির নামকরণ কিছু শুদ্ধ এবং কিছু অশুদ্ধ দেওয়া আছে। কোনটি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তা নির্দিষ্ট ঘরে X চিহ্ন দিয়ে দেখান। যেমন**

| | শুদ্ধ | অশুদ্ধ |
|---|---|---|
| ক) কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত। | ☐ | ☐ |
| খ) কাশীরাম দাসের রচনা রামায়ণ। | ☐ | ☐ |
| গ) বড়ুচণ্ডীদাসের রচনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। | ☐ | ☐ |
| ঘ) শাক্তপদাবলী রামপ্রসাদের লেখা। | ☐ | ☐ |
| ঙ) নাথ সাহিত্য লিখেছেন ফয়জ্জুলা। | ☐ | ☐ |
| চ) রূপরাম বিখ্যাত রচয়িতা ধর্মমঙ্গলের। | ☐ | ☐ |
| ছ) অন্নদামঙ্গলকাব্য ভারতচন্দ্রের রচনা। | ☐ | ☐ |
| জ) 'মেঘনাদবধকাব্য' মধুসূদন দত্তের রচনা। | ☐ | ☐ |
| ঝ) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বিদ্যাপতির রচনা। | ☐ | ☐ |

**নিচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।**

ক)..... থেকে চর্যাপদের আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েব বিশিষ্ট কীর্তি।

খ) শ্রীকৃষ্ণবিজয়.....রচনা।

গ).....চৈতন্যদেবের জন্মস্থান।

ঘ) গোবিন্দদাস একজন.....কবি ছিলেন।

ঙ) .....সংস্কৃত 'কবি' অর্থে কবি নয়।

(চ) .....উনিশশতকের গদ্যলেখক।

## ৬.৪ উত্তর সংকেত

১। ক-৫, খ-১, গ-১

২। নারী, গুণরাজখাঁ, বড়ুচণ্ডীদাস, চৈতন্যমঙ্গল।

১। ক-১, খ-৩, গ-৩, ঘ-১

২। মহাভারত— কাশীরামদাস, মনসামঙ্গল— কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, ধর্মমঙ্গল— রূপরাম, বৈষ্ণবপদাবলী— জ্ঞানদাস। সতীময়না— দৌলতকাজী।

৩। ক) নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার।

খ) মালাধর বসুর।

গ) নবদ্বীপ।

ঘ) বৈষ্ণব।

ঙ) কবিওয়ালা।

চ) রাজা রামমোহন রায়।